Available online at http://www.ijims.com
ISSN - (Print): 2519 – 7908 ; ISSN - (Electronic): 2348 – 0343
IF:4.335; Index Copernicus (IC) Value: 60.59; Peer-reviewed Journal

"Pancham Purush"a new vision By Bani Basu

"বাণী বসুর 'পঞ্চম পুরুষ' অন্য ভাবে দেখা "

Madhuri Nath
Assistant teacher: SambalpurAnchal High School, Sambalpur Tal, Dist- Malda, West Bengal, India

Abstract

Bani Basu's psychological novel, **"Pancham Purush"** was written in 1990. The novelist's main goal is to uncover the complex mystery of the character's secret chamber, through the motions of the psychological view. Writer promotes all the critical commentary of everything in the novel. Extremely complex love variations are spread in the novel. Due to the fascination of Aritra to Neelam and then completely lacking to the past youth of Neelam, and then again the strong addiction to college life lover Esha Khan. Aritra wanted to seek the whole thing sexual. His love is doubtful. The great love of Mahanam and Esha is unshakable, irreconcilable, beyond institutional recognition. Neelam, Aritra's sex, love has made us stand in the world of a real world beyond bridal bragging. Neelam ignored Aritra completely coming back from Ajanta, but in spite of that, waiting for the glory of the heavens. The patriarchal society has kept women in commodity, women were not able to completely free themselves from this ritual. Neelam has accepted another man Aritra by fulfilling the sex of Mahanam. Neelam is as relaxed as the object of man's desire, and Shima also. Vikram is not satisfied with one woman. In addiction to the female, he enjoyed many women. Do not go happy with Shima. So he can go away from his wife and be addicted to another woman. The patriarchal society does not question any of the man's pluralistic entity. The author did not even pick up. She has developed a man's artistic psychology. Esha Khan and Mahanam had so personality that there is no desire to be asked in their lives. Esha is reluctant to conceive in the womb of her husband without love. Even the end of the relationship she did not think twice. Seeking secretly for the release from the family, she got a job in a college. In the intellectual suffrage, she ignored the institution of marriage. At the end of the Ajanta Cave travelling, she realized that she had become a incomplete woman. She becomes surplus without the greatness of Mahanam. So devoting herself to Mahanam has become convincing towards fullness. The feminine desires of the woman are scattered throughout the novel. Shima thinks that women consume male consumption. Aritra credited with fulfilling her incomplete desire. Aritra persuades Shima to think as Esha. Writer has given intellectual plaques to the darkness of human mind. The unique uninterrupted images of modern men are sketched by the writer very clearly.

Keywords: Psychological, Promotes, Commentary, Love variations, Fascination, Patriarchal society, Commodity, Pluralistic, Entity ,Persuade, etc

Article

১৯৯০ সালে রচিত "পঞ্চম পুরুষ" বাণী বসুর অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। চরিত্রের মনোজগতের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রের গোপন প্রকোষ্ঠের জটিল রহস্য উদঘাটন করাই এই জাতীয় উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্য থাকে।লেখিকা ভালোবাসা, প্রেম, কাম দাম্পত্য সমস্ত কিছুর জটিল ভাষ্য উপজীব্য করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে। বহুকৌণিক জটিল প্রেমের ভিন্নতা 'পঞ্চম পুরুষ' উপন্যাসে পরতে পরতে ছড়িয়ে

আছে। অরিত্রর নীলমের প্রতি মোহময় আকর্ষণ এবং পরে বিগতযৌবনা নীলমের প্রতি পুরোপুরি নিরাসক্তি, আবার তখনই কলেজ জীবনের প্রেমিকা এষা খানের প্রতি তীব্র আসক্তি। অরিত্রর এই চাওয়া না চাওয়া পুরোটাই কামজ। তাঁর ভালোবাসা সন্দিগ্ধ। মহানাম এষার প্রেম বন্ধনহীন, সংস্কারহীন, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির উর্ধ্বে। নীলম অরিত্রর কাম, প্রেম ভালোবাসা দাম্পত্য বৌদ্ধিকতার উর্ধ্বে এক অধিবাস্তবের জগতে আমাদের অবস্থান করায়। নীলম অজন্তা থেকে ফিরে অরিত্রকে পুরোপুরি উপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু তবু যেন মনের গহীনে অরিত্রর জন্য অহর্নিশ অপেক্ষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে ভোগ্যই করে রেখেছে, নারীও এই সংস্কার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি। নীলম মহানামের কামকে চরিতার্থ করতে দিয়েও আর এক পুরুষ অরিত্রকে গ্রহণ করেছে। নিজেকে পুরুষের কামনার বস্তু রূপে দেখতে নীলম যেমন স্বচ্ছন্দ, সীমাও তাই। বিক্রম আবার এক নারীতে সন্তুষ্ট নয়। স্ত্রী সীমাকে ছাড়াও সে বহু নারীকে ভোগ করেছে। অতৃপ্তি বিক্রমের কিছুতেই ঘোচে না। তাই সে বেড়াতেও গিয়ে স্ত্রীর পাশ থেকে সরে গিয়ে অন্য নারীতে আসক্ত হতে পারে। পুরুষের বহুভোগী সত্তা নিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোন প্রশ্ন তোলে না। লেখিকাও তোলেন নি। তিনি উপজীব্য করেছেন পুরুষের কামজ মনস্তত্ত্বকে। এষা খান ও মহানাম এতটাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে এঁদের জীবনে চাওয়া পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই অবশিষ্ট নেই। ভালোবাসাহীন স্বামীর সন্তান গর্ভে ধারণ করতে এষার অনীহা। এমনকি সম্পর্কের ইতি টানতেও দ্বিতীয়বার ভাবেনি। আত্মপ্রত্যয়ী এষা সংসার থেকে মুক্তির জন্য গোপনে আবেদন করে কলেজে চাকরি পেয়েছে। বৌদ্ধিক প্রত্যয়ে সে বিবাহ নামক প্রাতিষ্ঠানিকতাকে উপেক্ষা করেছে। অজন্তা গুহা দর্শন শেষে এষা উপলব্ধি করে তার সম্পূর্ণ নারী হয়ে ওঠার অসম্পূর্ণ পরিক্রমা। সে যেন উদ্বৃত্তই থেকে যেত মহানাম ছাড়া। তাই মহানামে নিজেকে সমর্পণ করে প্রত্যয়ী হয়েছে পূর্ণতার অভিমুখে। উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নর নারীর অবদমিত কামনা বাসনা। সীমা মনে করে সে পুরুষের ভোগ্য। তার অপূর্ণ কামনা চরিতার্থ করতেই ধরা দেয় অরিত্রর বাহুডোরে। অরিত্র তাকে এষা মনে করে প্রেষণা করেন। রক্ত মাংসের মানুষের অন্ধকার মনোজগতকে বৌদ্ধিক প্রলেপ দিয়েছেন লেখিকা। অতলে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন আধুনিক নরনারীর একান্ত গোপন যাপন চিত্র।

অরিত্র চৌধুরি স্বপ্নের ঘোরে অবচেতন মনে কতকগুলো ছবি দেখেন। তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ঠিক করতে পারেন না, ছবিগুলো তার আশঙ্কা নাকি মনের দুর্বলতা। কিছুদিন আগেই তাঁর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, এখন অনেকটাই সুস্থ। বাইরের সব কাজ মেয়ে পুপুই করে। স্ত্রী নীলম বাড়ির সব কাজ করে সময় বের করতে পারে না। নীলম খুব স্ফিত হয়ে গেছে। মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই হিসটেরেকটমি ধরা পড়ে তার। ডাক্তার বলেছিলেন অপারেশন না করলে ইউটেরাইন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আর অপারেশন করালে স্ত্রী-ত্ব ফুরিয়ে মা হয়ে উঠবে বেশি। স্ত্রীর জীবন রক্ষার্থে অরিত্র অপারেশন মেনে নিয়েছিলেন। নীলম তাই অকাল মধ্য বয়সে পৌঁছে গেছে।

পিকু–এষা এক বাড়িতে থাকে। পিকু বাইরের জগতের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে ভালোবাসে। এষা বিপরীত। নিজের জগত নিয়ে বাড়িতেই স্বচ্ছন্দ। দীর্ঘদিন বাড়িতে থাকার পরে এষার মাথায় হঠাৎ কুমোরের চাকা ঘোরে। তখন সে যে করেই হোক ছুটে বেরতে চায় নিজের গণ্ডির বাইরে। হঠাৎ এষার ইচ্ছে হয় অজন্তা যাওয়ার। বারো বছর বয়সে মাসি মেসোর সঙ্গে একবার গিয়েছিল। দীর্ঘ আঠারো বছর পরে এষা অরিত্র চৌধুরীকে টেলিগ্রাম করে জানায় সে যাচ্ছে অরিত্রর কাছে। এষার আগমন সংবাদে নীলম চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এত বছর পরে এষা আবার কেন তাদের সংসারে আসতে চাইছে, নীলম ভেবে উদ্বিগ্ন। অরিত্র কল্যাণ স্টেশনে এসেছেন এষাকে নিতে। গাড়িতে করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছেন দুজনে। নীলম বিক্রম সীমাকে ডেকে এনেছে, কারণ অনেকের মাঝে এষাকে নিয়ে কোন অস্বস্তিকর পরিবেশে তাকে পড়তে হবে না।

মহানাম রায়ের গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এষাও ছিল। মহানাম রায় অরিত্র চৌধুরির বাড়ি এসে পৌঁছলে, অভ্যর্থনা করার জন্য দরজা খুলে দাঁড়ায় এষা। মহানামের ধারণা হয় অরিত্র এষা, নীলম দুজনকেই বিয়ে করেছেন। পুপুর মধ্যে মহানাম নিজের ব্যক্তিত্বের ছাপ দেখে ভাবেন পুপু

তারই সন্তান নয় তো? অরিত্র একসময় মহানামের ছাত্র ছিলেন। কেন নীলম তার সংঙ্কটপূর্ণ অবস্থাতেও মহানামের ওপর ভরসা না করে অরিত্রকে বিয়ে করেছিল তার উত্তর খুঁজতে এসেছেন মহানাম অরিত্রর বাড়িতে। এষাকে নিয়ে নীলম একদিন বেড়াতে যায়। সেখানে এষাকে তার অতীত নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে নীলম। এষা বলে তার অবসরপ্রাপ্ত জজ শ্বশুর তার সাথে মাইনে করা সেবিকার মত ব্যবহার করতেন। শাশুড়ি পরিচারিকার মত আর স্বামী ব্যবহার করতো বাথরুমের মত। তাই শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ। কলেজের চাকরিও পেয়েছে গোপনে আবেদন করে। শ্বশুর শাশুড়ি মেনে নিতে পারেননি। এষাকে জানার পরে নীলম মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নীলম জানে এষার কাছ থেকে অরিত্রকে কেড়ে নিয়েছে সে। অথচ এষা বুঝতেই পারেনি দীর্ঘ পনেরো বছর পরে কলকাতা থেকে পুনে কেন সে একা একা যাচ্ছে। অজন্তা ইলোরা দেখার লোভ না, অন্য কিছু?নীলমের নিমন্ত্রণে বিক্রম আর সীমাচল বোম্বে থেকে পুনে এসেছে। সবাই মিলে অজন্তা ইলোরা দেখতে যাবে। এষার একার উপস্থিতি নীলমের পক্ষে অসহ্য হবে মনে করে নীলম বিক্রম সীমাচলকে ডেকেছে। বিক্রমের অনুমান নীলমের অতিথি এষা নিশ্চয়ই কোন বাঘিনী। অরিত্র এষার সাথে একা সময় কাটাতে পারছেন না বলে, এষাকে নিয়ে বাজারে যাওয়ার বায়না করেন । পুনে স্টেশন হতে প্রিয়লকরনগরের বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে শুধু নিজের একান্ত কথা বলেছিলেন এষার সাথে, তবু কথা ফুরোয় নি। কোনদিন ফুরোবেও না। অরিত্রর আবদারে শিল্কের শাড়ি পড়ে, কানে মুক্তো পরে এষা অরিত্রর সাথে বাজারে এসেছে মাংস কিনতে । এষা সবাইকে মাংস রেঁধে খাওয়াবে, যদিও সে নিজে মাংস খায় না। নীলম বিক্রমের সাথে এষার পরিচয় করিয়েছে, তাদের বন্ধু বলে। বিক্রমের উপস্থিতি অরিত্রর কাছে অস্বস্তিকর। কারণ মহিলা মহলকে বশ করাতে বিক্রমের জুরি মেলা ভার। অরিত্র বিক্রমের স্ত্রী সীমাকে ছোটবোনের মত স্নেহ করেন। বিক্রম বোম্বের নাম্বার ওয়ান বিল্ডিং ও রোড কনট্রাকটার। দুই পরিবার আনন্দ দুঃখ একসঙ্গে ভাগ করে নেয়। পুপুকে একরকম কোলে পিঠে মানুষ করেছে বিক্রম। কিন্তু অরিত্র যতটা আস্থা বিক্রমকে দিয়েছেন, বিক্রম তার মর্যাদা রাখতে পারেনি। নীলমের সঙ্গে বিক্রমের সম্পর্ক রাখাটাও অরিত্র মেনে নিতে পারেননি, পুপু একটা বাধা তো ছিলই। সীমাচল খুব মিষ্টি স্বভাবের চঞ্চল মেয়ে। কোন মতেই অরিত্র তাকে আঘাত করতে চাননি। বিক্রম সীমার সমস্ত পার্থিব চাওয়া পাওয়া পূরণ করে, তাই বিক্রমের ব্যাভিচারকে মেনে নেওয়া ছাড়া সীমার কোন উপায় নেই। অরিত্ররা এষা সহ ঔরঙ্গাবাদ যাচ্ছেন, দুদিনে তাঁরা অজন্তা ইলোরা দেখবেন । পুপুর পরীক্ষা বলে নীলম যাবেনা, এমনটাই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু পুপু বন্ধুর কাছে হোস্টেলে থেকে পরীক্ষা দিতে পারবে, তাই ঠিক হয় নীলমও যাবে বেড়াতে। সীমা বিক্রমের বিশ্বাসহীনতায় একান্তে কাঁদে। একমাত্র ছেলেকে তারা হোস্টেলে রেখে পড়ায়। অরিত্র, নীলম, এষা বাসে করে ঔরঙ্গাবাদ পৌঁছেছেন, বিক্রমের গাড়িতে মহানাম, বিক্রম আর সীমা। দৌলতাবাদ ফোর্ট দেখে তারা ইলোরা গেছেন। এষা দৌলতাবাদ ফোর্টের ভিতরে যায়নি। কারণ সংগৃহীত ইতিহাস তাকে কিছু দেবে না। সীমা জানে নীলম এষাকে, এষা নীলমকে পাহারা দিয়ে রাখবে। কিন্তু ফোর্ট থেকে সবাই এক এক করে ফিরে এসেছেন। সীমা মহানামের পেছন পেছন ফোর্টের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠছিল। সীমা দেখে এষা ছবি তোলার জন্য মহানামের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কারণ মহানাম জানেন কোন ছবিগুলো সংগ্রহে রাখার মত। বিক্রম কোলে তুলে নীলমকে উঁচু রোয়াকে উঠতে সাহায্য করে। মহানামের চোখে এ দৃষ্টিকটু, তাই তিনি অরিত্রকে ধীরে এগোতে বলেন। ইলোরার বৌদ্ধগুহা, জৈন গুহা, ত্রিতল বিহার, কৈলাস মন্দির দেখেছেন তাঁরা। কৈলাস মন্দিরের প্রাঙ্গনে এসে মহানাম বলেছেন-

তোমরা একটু ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখো, এই মন্দির পাহাড় কেটে তৈরি। এই পাহাড় নমনীয় ব্যসল্ট পাথরের। না দেখে শুনে স্থপতিরা মন্দিরের কাজে হাত দেন নি। সাধারণ দেবালয়ের মত নীচ থেকে গাঁথুনি দিয়ে তৈরি নয় এসব মন্দির বা গুহা । ওপর থেকে কেটে কেটে নেমেছেন শিল্পীরা। বাটালির দাগ,ছেনির দাগ ওপর দিকে তাকালেই দেখতে পাবে।[১]

শিব- পার্বতীর পাশা খেলার ভঙ্গি, পার্বতীর গ্রাম্য ভঙ্গি, বিবাহ দৃশ্যে সলজ্জ নারী মূর্তি সমস্তই শিল্পী ফুটিয়ে তুলেছেন গ্রাম্য আঙ্গিকে। চোল রাজত্বকালে অগ্নিবলয় বেষ্টিত সাংকেতিক মুদ্রায় নটরাজ, লৌকিক কল্পনার স্থূলোদর আশুতোষ শিবের চেয়ে অনেক তরুণ এখানকার শিবমূর্তি। মহিষাসুর মর্দিনীর মতই যুদ্ধকালেও মুখে প্রসন্ন বরাভয়ের হাসি। আর সমুদ্র মন্থনকালে যে সুরা উঠে এসেছিল, দেবতারা গ্রহণ করেন বলেই তা সুরা আর অসুররা বর্জন করেন বলেই তারা অসুর বলে খ্যাত হয়। প্রাচীন আর্য জাতি যেহেতু প্রচণ্ড শীতের দেশ থেকে এসেছিল, তাই সুরাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় পানীয় বলে মনে করত। আর অরিত্রর মনে হয়েছে সমুদ্র মন্থন আসলে ফার্টিলিটির মিথ। সমুদ্র যোনি আর মন্দর পর্বত লিঙ্গের প্রতীক। "উত্থিত যা কিছু অর্থাৎ লক্ষ্মী, ঊর্বশী, অপ্সরা, ধন্বন্তরী, এসবই সেকশুয়াল অ্যাটাকের ঐশ্বর্য প্রকাশ।"[২] অরিত্রর এই ব্যাখ্যা শুনে মহানাম বিক্রম দুজনেই খুব অবাক।

মহানাম স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের ছবি তুলে গেলেন। মানুষের স্মৃতির কোন দাম হয়তো তার কাছে নেই। এষা বলেছে মহানামকে। লজ্জিত মহানাম সকলের ছবি তুলতে চাইলে এষা লজ্জায় নিজের মুখ ঢেকে নিয়েছে। অরিত্র সকলকেই ক্যামেরা বন্দী করেছেন। কৈলাশের মন্দির খুব অ্যাপেলিং মনে হয়েছে অরিত্রর। আসলে শিল্প কীর্তি যখন বিরাট হয়, তখন আলাদা একটা মাত্রা পায়। পৃথিবীর বিশেষ করে, প্রাচীন পৃথিবীর যত আর্ট সব ধর্মকে কেন্দ্র করে। অথচ সেই সুন্দরের আধার স্বরূপ ধর্মই এখন আমাদের সবচেয়ে বৈরি। আসলে শিল্প আর ধর্মের জন্য একই ধরণের প্রেরণা কাজ করে।

সীমা মনে করে লোভনীয় জিনিস বেওয়ারিশ পড়ে থাকলে লোক জনগণের সম্পত্তি মনে করে। এ কথা শুনে এষা বিষন্ন, কেন কোন মেয়ে নিজেকে অন্যের সম্পত্তি ভাববে ? আসলে অন্যের উপর নির্ভরশীলতার দিন শেষ। প্রত্যেকে স্বাধীন সত্তা। সীমার আক্ষেপ, তার ছেলে টিটো তার ওপর নির্ভরশীল নয়। বিক্রমও স্বাধীন। এষা জানে মেয়েরা স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হয়েই গর্ববোধ করে। এষা নিজে তেমন নয়, তাই ডিভোর্সের পরেও দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা ভাবে নি। এষার মত মেয়েরা জটিল চরিত্র। তারা নিজেরাই জানে না কী চায় ? সমস্ত জিনিষের প্রতি তাদের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব। একই সঙ্গে চাওয়া, না চাওয়া। আর এষা ভোগে আর এক রোগে, একই সঙ্গে পাওয়া, না পাওয়া। হঠাৎ রাতে বিক্রম আর অরিত্র সন্দেহ বশে দুজন দুজনের মুখোমুখি হয়। মহানাম সবটাই দেখেন। অরিত্র, বিক্রম আর সীমার টিকিট বাদ দিয়ে চারটে টিকিট কাটেন বাসের। বিক্রমের গাড়িতে ফিরবেন না। ফেরার সময় মহানাম আর নীলম পাশাপাশি বসেছেন। আর তাদের পাঁচ সারি পেছনে বিক্রম আর এষা। পুনে আসার পথে এষা শুকনো নদীখাতে পাথরে তৈরি হাতির পাল দেখেছিল। অরিত্র বা অন্য কাউকে দেখাতে পারলে তার দেখার আনন্দ পূর্ণ হোত। অরিত্র ভেবেছেন এষা এসেছে তাকে দেখতে, দেখা দেবার জন্য, কাছে পাবার জন্য। কিন্তু এষা আসলেই অজন্তা দেখতে গেছে। অরিত্রকে চাওয়া তার নিঃশেষ না হলে এষা যেতই না। অরিকে চাইলে এষার অপমান, প্রত্যাখ্যান, ব্যবহৃত হওয়ার বেদনা টাটকা ক্ষতের মত দগদগে থাকতো। এসবের খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে তাই সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে এষা অরিকে দেখেছে। অরি এষার কাছে তার অতীতের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এষার জীবনে এসব কিছুর প্রয়োজন নেই। অরিত্র আবার এষাকে কাছে পেতে চাইছেন। নীলমই তাকে বাউন্ডুলে থেকে গৃহী করতে পেরেছে অরিত্রর নির্বাচন ঠিক ছিল। অরি মরিয়া হয়ে যুক্তি জাল বিস্তার করেন। এষা বিরক্ত হয়ে বলে "তুমি নীলমকে চেয়ে আমাকে ছাড়লে, আবার নীলমকে পেয়ে আবার আমাকে চাইছ, আমাকে পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই আর কাউকে চাইবে। তোমরা মোটামুটি একই রকম স্বভাবের।"[৩] এষা অরিকে জানিয়েছে অরি যে এষাকে প্রেষণা করেছে, নীলমের মধ্যে তা খোঁজেইনি। তাই নীলমকে অরি পুরোপুরি পাননি। অরির সন্দেহ নীলম আজও মনে মনে মহানামকেই চায়। নীলমের আসল আগ্রহ স্থাপত্য এবং সেই সঙ্গে অরি, এষা, মহানাম। মহানাম নীলমের কাছে কেন কৈফিয়ত আদায় করলেন না, কেন নীলম মহানামের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে অরিত্রকে বিয়ে করেছে? পুপু মহানামের সন্তান, মহানাম

জানলেন, অরিত্র, নীলম আগেই জানতেন, পুপুও অনুমান করে মহানামের সাথে তার কোথাও যেন যোগ আছে। ইলোরা মানুষের সংস্রব থেকে দূরে ধ্বংসপ্রাপ্ত নয়, অথচ পরিত্যক্ত। অজন্তা সম্পর্কে জানা যায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন ইংরেজ সৈনিক অজন্তা পাহাড়ে শিকার করতে এসে নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি খিলান আর স্তম্ভ দেখতে পায়। "ইন্ধ্যাদ্রি পর্বতমালার ওপারে তাপ্তি বেসিন, এধারে দাক্ষিণাত্য মালভূমি। ছোট্ট বাগোরা নদী পাহাড়ের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে এসেছে। সাতকুণ্ড জলপ্রপাতের কাছ বরাবর এই নদী একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক নিয়েছে। এখানেই অজন্তা গুহামালার অবস্থান।"[৪]সব মিলিয়ে ত্রিশটি গুহা আছে। পাঁচটি চৈত্য বা উপাসনা গৃহ বাকি পঁচিশটি সঙ্ঘারাম বা বিহার। প্রায় ছয় সাত'শ বছরে তৈরি হয়েছিল এই পুরাকীর্তি। পাহাড় কেটে এত বড় হল ঘরের মত বানানো যায়- এষা বিস্মিত আর এত ঠাণ্ডা যেন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। গর্ভ মন্দিরের বুদ্ধ মূর্তির মুখাবয়ব বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকম। মহানাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানুষের দুঃখে বুদ্ধের গৃহত্যাগ শিল্পীর হয়ত পছন্দ হয়নি, তাই বিভিন্ন ভাবে এঁকেছেন। আর তারপর গাইড অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির আলেখ্যের ওপর আলো ফেললেন। দেখা গেল ডান হাতে ফোটা পদ্ম, মাথায় মণি মানিক্যময় রত্নমুকুট। কানে হিরের কুণ্ডল, কণ্ঠে বেষ্টন করে আছে মুক্তার শতনরী। ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে ভাবাবেশে লীন। অপর দিকে অবলোকিতেশ্বর বজ্রপাণি। জরা, মৃত্যু, ব্যধি অধ্যুষিত মরজগৎ। ভাব ব্যঞ্জনাময় গভীর কারুণ্য। বোধিসত্ত্বের প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য সীবলি, বা মারকন্যা, নাগরানী সুমনা, কৃষ্ণা রাজকুমারী প্রত্যেকের বিষাদের কারণ জগতের যাঁরা শ্রেষ্ঠ পুরুষ, সমস্ত জগতের দুঃখ একটি নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। নীলমের মনে হয়েছে কৃষ্ণা রাজকুমারী এমন "এক হতভাগিনী নারী যে অনেক পেয়েও কিছু পায়নি। অনেক পাওয়া যার মিথ্যা ব্যর্থ হয়ে গেছে এক বিশাল না পাওয়ায়।"[৫] অরিত্র ভাবতো সে একাই কবি, এখন বুঝতে পারে নীলম, এষা, সীমা আসল কবি। কারণ অজন্তার স্থাপত্য এই তিন নারী ঠিকঠাক বুঝেছে। সপ্তম শতাব্দীর আলেখ্যের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর তিন নারী জীবন-সত্য দেখতে পেয়েছে। শিল্পীর সাফল্য কী বিরাট তা এখানে সহজেই অনুমেয়।

আর একটি গুহা সম্ভবত লেকচার হল হিসেবে ব্যবহৃত হত। মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাইলে মাইক্রোফনের মত একো সমেত ধ্বনিত হয়। এই অডিটোরিয়ামে অল্পবয়সী শ্রমণদের শিক্ষানবিশী চলতো। বৌদ্ধ শ্রমণেরা গুহার পর গুহা দেওয়াল জুড়ে ন্যুড এঁকে রেখেছে। কোন সন্দেহ নেই "প্রব্যজ্যা গ্রহণ করবার পর নির্জন গুহায় দিনের পর দিন নারী সঙ্গহীন কাটাতে কাটাতে লিবিডোর তাড়নায় এই সব চিত্রশিল্পের জন্ম।"[৬] যেমন খাজুরাহো কোনারক, জগন্নাথ মন্দির। খাজুরাহোর চৌষট্টি যোগিনী দেখে যেমন বিক্রম ঘেমে নেয়ে যায়, এই চিত্রগুলো তত কামোত্তেজক নয়, তবে বিক্রমের আপত্তি এগুলোকে ধর্মের পোশাক পরিয়ে উপস্থাপনা করাতে। নীলমের কাছে বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের ভাস্কর্যটি মুগ্ধকর। ছবির চেয়ে স্থাপত্য, স্থাপত্যের চেয়ে ভাস্কর্য তাকে বেশি মোহিত করেছে। গুহা চৈত্যের অন্তরাল হতে নীলমের কানে ধ্বনিত হয়েছে "সম্মা দিট্‌ঠ, সম্মা সঙ্কপ্পো, সম্মা বাচা, সম্মা কম্মন্তো, সম্মা আজীবো, সম্মা বায়ামো, সম্মা সতি, সম্মা সমাধি"[৭] । নীলমের মধ্যে ভাবান্তর এসে গেছে।

সারনাথের ধর্মচক্র মুদ্রায় আসীন সিদ্ধার্থ। সদ্য বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। যিনি বলেছেন বন্ধন দুঃখের কারণ। অবধান করলে জানা যায়। কামনা বাসনা এ দুঃখের মূল। উৎপাটনের উপায় হল কামনা বাসনাকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করা। নীলম আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। একটা কামনা থেকে আর একটা বাসনায় ভ্রমণ ছাড়া কী বা করেছে সে ? কী অশান্ত যৌবন কেটেছে, কী উত্তাল। কত শত মৃগয়ায় সমৃদ্ধ না ক্লিন্ন ! বুদ্ধের এই মহাপরিনির্বাণ দেখার পর নীলম কী করে তার সংসারে ফিরে যাবে ? এষার প্রতি নীলমের কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ছে, এষা না এলে নীলমের অজন্তা দেখা হতো না। মনে মনে অরিত্রকে এষার কাছে নিবেদন করলো আজ। এক সে নিজে অরিত্রকে এষার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। কলেজ স্ট্রীট চত্বরের সবচেয়ে নারীলোভন পুরুষটি এষাকে ছেড়ে তার কাছে আসায় আত্মপ্রসাদ, বিজয়বোধ করেছিল সে। আজ নীলম বুঝতে পারে সে গর্ব কত অসাড়, কত পাপ। নিজে মহানামকে প্রবঞ্চনা করেছিল। মহানাম কোন শাস্তি দেননি। ক্ষতিপূরণও দাবি করেননি।

পুপুকে ফিরিয়ে দিয়ে নীলম মহানামের কাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে। পুপুকেও সব জানিয়ে দিতে চাইছে। কত মহান ব্যক্তির সন্তান পুপু। তাকে তা জানিয়ে দিয়ে পাপবোধ থেকে মুক্তি পেতে চাইছে নীলম। অরিত্র নীলমের এই ভাবান্তর লক্ষ্যই করেননি। তার কাছে সমস্ত অজন্তা এষাময়। উনিশ বছরের পুরনো স্মৃতিতে ফিরে গেছেন অরিত্র। কীভাবে এষাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আর আজ কী প্রবল তৃষ্ণা এষার প্রতি। অরিত্র ভেবেছেন এষা চাইলে নীলমের কাছে ডিভোর্স চাইবেন, এবং বাকি জীবন এষার সাথে বোম্বেতে কাটাবেন। সীমা এতদিনে নিজেকে আবিষ্কার করেছে। তার একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বিক্রম। বিক্রমের সামনে পূর্ণ মহিমায় নিজেকে উপস্থাপন করতে চায় সীমা। সিদ্ধার্থ তাঁর ভাই গৌতমী পুত্র নন্দকে প্রব্রজ্যা দিচ্ছেন, এই সংবাদে নন্দর বাগদত্তা জনপদকল্যানী মৃত্যু-মূর্চ্ছায় এলিয়ে পড়েছে। যেন তার প্রতিধ্বনি হচ্ছে এষার শূন্য গর্ভে। হৃদয়ের ফাঁকা প্রকোষ্ঠে। বেদনার যে তীব্রবোধ আচ্ছন্ন করছে, বিদ্ধ করছে, সেই বিদ্ধ চেতনাকে কোন নামে এষা চিহ্নিত করতে পারছে না।মাটির নীচ থেকে ধুম্রজালের মত উচ্ছ্রিত হয়ে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে শূন্যে। এষা হয়তো এখনই আয়নোস্ফিয়ার অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে মহাশূন্যে। আর এই সময় মহানাম আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন এক তুলনাহীন আনন্দে। তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপ যেন এক মহাপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় শতদল পদ্মের মত ফুটে উঠেছিল। প্রত্যেকটি গুহাচিত্রের জাতক কাহিনীর বিশদ ব্যাখ্যা শোনাচ্ছিলেন সঙ্গীদের। কম্পিয়া জাতক, বিশ্বম্ভর জাতক, পূর্ণ ভাবিলার কাহিনী, অজন্তা ফ্রেসকো, মিকালোঞ্জেলোর বিখ্যাত লাস্ট জাজমেন্ট, সিসটিন চ্যাপেল, চিনের টুন- হুয়াং গুহাচিত্র। আর ব্যাখ্যা করছিলেন- প্রাগৈতিহাসিক মানবও এই গুহাকেই কেন তার শিল্পসাধনার পীঠস্থান বলে মনে করেছিল। স্থান নির্বাচনে শিল্পীতে শিল্পীতে এই যোগসূত্র। আরও বলেছিলেন কালিদাস সাহিত্যের চিত্ররূপ হিসেবে অজন্তা চিত্রকে দেখবার আলাদা আনন্দের কথা। কারণ অজন্তা চিত্র আর কালিদাসের কাল, অর্থাৎ কালিদাস প্রভাবিত ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের কাল মোটের ওপর সমসাময়িক। “কুমারসম্ভব” বিশেষ করে মেঘদূতের চরিত্রগুলিই যেন শিল্পীর তুলিতে গুহায় গুহায় ফুটে উঠেছে।[৮]

এষা অরিত্রর স্মৃতিতে ফিরে আসে ডাফ লেনে মহানামদার বাড়িতে যাবার প্রথম দিন। মহানামদার কথাতেই শুধু আবদ্ধ থাকতে চান না অরিত্র। আর এষার কথা হল-“কথা যে ছড়িয়ে আছে, জীবনের সবখানে, সব গানে/ তারও পরে আছে বাঙ্ময় নীরবতা।”[৯] নীলম, বিক্রম সীমা বাড়ি ফিরে গেছে। এষা, মহানাম আরও একদিন অজন্তা উপভোগ করতে চান। অরিত্র এষাকে নিবিড় করে পাবার আশায় নীলমের সাথে ফিরলেন না।এষা অরিত্রকে পুরনো স্মৃতির উজ্জীবন, পুরনো অপরাধের ক্ষমা, অবিনাশী বন্ধুত্ব সব দেবার পরেও অরিত্রর কাঙালপনা দেখে ক্ষুব্ধ। অরিত্র মনে করেন তাকে না পেলে এষা পূর্ণ হবে না। কিন্তু এষার কাছে অরিত্রর থেকে কিছু নিয়ে পূর্ণ হবার প্রশ্নই নেই। এষা সেই পিপাসা বহুকাল আগেই পেরিয়ে এসেছে। অরিত্র বলেন নীলমের সমস্ত রূপ গুণ যোগ করেও এষার নখের যোগ্য নয়। এষা বোঝে না নীলমের মত রূপবতী গুণবতী স্ত্রী পেয়েও কেন অরিত্রর এমন কাঙালপনা। অরিত্রকে ঘর থেকে বের করে দরজা বন্ধ করে দেয় এষা। এষা আর পুনে ফিরবে না বলে ঠিক করে। কিন্তু মহানাম এষাকে বারবার হেরে যেতে দেবেন না। তিনি এষাকে আশ্বস্ত করেন কলকাতা পর্যন্ত এষার সাথে থাকবেন। পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী এষা ফিরবে। অজন্তা থেকে পুনে, সেখানে দু একদিন কাটিয়ে বোম্বে। তারপর গোয়া। গোয়া থেকে বোম্বে ফিরে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা ফেরার কথা।

এষা, অরিত্র, মহানাম ফিরেছেন পুনেতে। মহানাম, এষাকে অরির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেও বাড়িতে ঢোকেননি। পুপু এষাকে বলে সে হয়ত কোন জন্মে মহানামের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল। নিজের চেহারার সাথে মহানামের চেহারার মিল খুঁজে পেয়েছে। এষার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় কীভাবে নীলম একই সাথে মহানাম আর তাকে ঠকিয়েছে। রাতে ঘুম আসে না এষার, ছাদে চলে যায়, একা। নীলম ছাদে গিয়ে ধন্যবাদ জানায় এষাকে। এষা ক্ষমা, ভালোবাসা, সঙ্গ সব দিয়েছে নীলমের জীবনে। এষার কাছে নীলম স্বীকার করে মহানামের সন্তানসহ সে অরিত্রকে বিয়ে করেছে, অরিত্র

তা জানেন। জানতেন না মহানাম, এষা। এষা নীলমের কাছে প্রকৃত কারণ জানতে চায়। মহানাম কি তাঁর সন্তানের দায়িত্ব নিতে চাননি? নাকি নীলমই অরিত্রকে গ্রহণ করেছে? নীলম জানায়- মহানাম তাঁর সন্তানের কথা আজ আঠারো বছর পরে জানলেন, এষা। পাছে তিনি আমাকে আটকান, তাই আমি তাঁকে জানাই-ই নি। চয়েসটা আমারই। দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। অরি সে সময় মহানাম সম্পর্কে নানা রটনার কথা বলে আমাকে একেবারে বিমুখ করে দিয়েছিল। তাছাড়া তুমি তো জানই তার প্রেম করবার তুমুল ধরণ- ধারণ। যে কোন মেয়েকে যে কোন বয়সে সে জাদু করতে পারে। যদি চায়।[১০]

নীলম এষা দুজনে মিলে ঠিক করে এখন থেকে নীলম অরিত্রকে উপেক্ষা করবে। সীমার বোম্বের বাড়িতে তারা সবাই উঠবে, সেখান থেকে গোয়া যাবে। সীমার বাড়িতে নীলম আর পুপু থেকে গেল। পুপু আগে গোয়া দেখেছে, তাই আর যাবে না। নীলম পুপুকে বুকে আঁকড়ে ধ'রে, অরিত্রকে এষা, মহানাম, সীমা বিক্রমের সাথে ছেড়ে দিল। স্টীমারে রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে সবাই। এষা উড়ুক্কু মাছ দেখছে। আরব সাগর দেখছে। সবার ব্যথা সমর্পণ করছে নীল জলে। জলের রং আরো গভীর হচ্ছে, কেউ খেয়াল করছে না। এষা টমেটো সুপ দিয়ে ড্রাই টোস্ট খাচ্ছে। অরিত্র সীমার আনা ভালো ভালো খাবার নাড়াচাড়া করছে। মহানাম, বিক্রম, সীমা মন দিয়ে খাচ্ছেন। অরিত্রর মনের অস্থিরতা ধরা পড়ছে একমাত্র এষার কাছে। কোনো মেয়ে তাকে উপেক্ষা করতে পারে, অরি এটা ভাবতেই পারছেন না। এষা নীলমকে বলেছিল মানুষের কাছে মানুষের যা না পেলে চলে না, সেখানে উপেক্ষা করতে। নীলম অরিত্রকে একেবারেই ত্যাগ করেছে। নীলম অনেকের প্রতি অনেক নিষ্ঠুরতা করেছে, কিন্তু অরির প্রতি এই নিষ্ঠুরতা এষাকে কষ্ট দিয়েছে। এষার মুখে অরির জন্য কোনো হাসি নেই। এষার চোখে অরির জন্য কোনো দৃষ্টি নেই। মহানাম পাইপ ধরিয়েছেন। বিক্রম স্কচ, গোয়ানিজ সুরমাই, চিকেন লিভার ভাজার ব্যবস্থা করেছে। মদ খেয়ে বিক্রমের কথা জড়িয়ে গেছে, বকবক করতে করতে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে শুরু করেছে। সাঁওতালনিরা নাকি মেয়েদের মধ্যে বেস্ট। মহানাম তাকে কফি খাইয়ে ধাতস্ত করার চেষ্টা করলেন। রাতে সীমা ঘুমিয়ে পড়লে বিক্রম অন্য কোন মেয়ে মানুষের খোঁজে চলে গেছে। সীমা মনে করে বিক্রম পতিত হওয়ার জন্যই জন্মেছে। আর তাকে এই কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে অরিত্রর রূপসী স্ত্রী নীলম, আর অরিত্রর বান্ধবী সেক্সি এষা। তাই বিক্রম আর সীমাকে চায় না। অরিত্রর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সীমা কাঁদতে লাগলো। অরিত্র সীমার দেহ মন্থন করলো এষা মনে করে। যে কোন নারী তো নারী, তারা শুধু জন্মেছে পুরুষের ভোগ্য হবার জন্যই। এই প্রাচীন ধারণার বাইরে সীমা বেরোতে পারেনি। এষা ব্যতিক্রম। তাই এষার প্রতি আকর্ষণ তীব্র। অরিত্র সীমাকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

মহানাম এষার বিবাহিত জীবনের এই পরিণতির কারণ জানতে চাইলে এষা জানায় হৃদয় না ভরলে ক্লান্তিকর অভ্যাসের যান্ত্রিকতায় গর্ভ ভরাতে সে চায় নি। তার স্বামী সন্তান চেয়েছিল, তাই বিচ্ছেদ। আর নীলমকে নাকি মহানাম তেমন করে চাননি বলেই ধরে রাখতে পারেননি। তবে মহানাম এও জানান- "নীলমই ছিল আমার কাছে একমাত্র নারী যাকে আমি বিনা পাপে স্পর্শ করতে পারতাম।"[১১] মহানাম কোন কুমারী মায়ের পরিত্যক্ত শিশু। ডক্টর কস্তুরী মিত্র তাকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনে মানুষ করেন। তাই কোন মেয়েকে ভাল লাগলেই তাঁর ভয় হত হয়ত তাঁর কুমারী মা-ই বিবাহিত হয়ে এর জন্ম দিয়েছেন, অথবা তাঁর বাবা। তাহলে সেই মেয়ে রক্তের সম্পর্কে তাঁর বোন। আর নীলমের মা কস্তুরী মিত্রের বান্ধবী সাবিত্রী। যিনি গুজরাতি বিয়ে করেছেন। আর মহানামের মা সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বাঙালি মহিলা। এষার মা ষোলো বছর বয়সে এষার জন্ম দিয়েই মারা গেছেন। তার বাবা তিন চার মাস নিঁখুত বৈধব্য পালন করেন। সাদা থান পরতেন। তারপর আর সহ্য করতে না পেরে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। এষা নিশ্চিত করে সে কিছুতেই মহানামের বোন হতে পারে না। মহানাম আশ্চর্য হলেন অরিত্র কী করে এষাকে ফিরিয়েছিল ? এষা তখন বোঝেনি, এখন বোঝে অরিত্র এমন পুরুষ যে তার আকাশে দ্বিতীয় সূর্য সহ্য করতে পারে না। এষা বুঝতে পারেনি অরিত্র কথার সম্মোহনে

আকৃষ্ট করেছিল তাকে। এখন মহানামের সঙ্গ গুণে এষা যখন মহানামের দিকে ঝুঁকছে তখন অরিত্র নীলমকে সরিয়ে একই সঙ্গে মহানাম, এষাকে চূর্ণ করতে চাইছেন। এষা আজ স্বীকারোক্তি দিয়েছে জীবনের সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে সে এসেছিল মহানামের কাছে, মহানাম তখন তাকে বাদ দিয়ে নীলমকে অন্তরতম বলে বেছে নিয়েছিলেন। এষার জীবনে তখন হাহাকার শুরু হয়েছিল। মহানাম বলেন সে জন্যই- “তোমার মন্দির ভরব বলেই হয়ত এতদিন নিজের মন্দির শূন্য রেখেছি। সেই চির প্রথমাকে কে না চিনতে পারে। শুধু ইতিহাস আর পুরাণ মাঝখানে একটা ভয়ের নদী বওয়াতে থাকে বলেই তাকে চাওয়া হয় না। অমৃতের তৃষ্ণা তাই অন্য পানিয়ে মেটাতে হয়। এষা তুমি আমার সেই সমুদ্র সম্ভব অমৃত কুম্ভ।”[১২] মহানাম দেখলেন এতো সান্দ্রো বত্তিচেল্লির ভেনাস। যার সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গগুলি ব্যঞ্জনাময় কবিতার অলোছায়া দিয়ে ঘেরা। সা-এষা- সেই- এই। এষা সা। এই সেই। ধরিত্রীর কামনা সাগরে অশ্রু টলটল শুক্তির ওপর পা রেখে সে ঊর্ধ্বে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বুঝতে পারেন এ এক অপরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা। তিনি জানেন না কী আছে এর শেষে। ঘুমিয়ে পড়েছেন মহানাম। মুখে নিবিড় মৃত্যু মহাপরিনির্বাণ। রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে এষা সমুদ্র আর আকাশকে বললো- “আমার এই ঐশ্বর্য তবে আমি কাকে দেব? দশ হাতে দান করলেও এ যে শেষ হবার নয়। আমি কি তবে চিরকাল এমনই উদ্বৃত্ত থেকে যাব। চিরটাকাল? এ কেমন নিষ্ঠুর নিয়তি।”[১৩]

ঠিক তখনই তাকে কে যেন পিছন থেকে ডাক দিয়েছে। সারারাত খুঁজে পায়নি। এষা কেবিনের সামনে ডেকে উঠে এসেছে। রাত পাতলা হয়ে এসেছে তখন। কেবিনের দরজা খুলে মহানাম বাইরে এসে বিবস্ত্র বিনিদ্র এষাকে দেখলেন। এষা জানায় “কে যেন আমাকে হরষিত করে দিয়ে চলে গেছে।”[১৪] মহানাম বললেন “আর কেন খুঁজবে এষা ! বুঝতে পারছ না ? পেয়েছ তো। পেয়েই গেছ ! সে আবার থেকে তোমার রক্তে রক্তেই বইবে, গাইবে। তোমার সমস্ত নিবেদন নিঃশেষে নিতে পারবে এবং আবার সহস্র গুণ রোমাঞ্চে ফিরিয়ে দেবে। এষা তীর্থ যাত্রা কখনও ব্যর্থ হয় ?”[১৫]

এষার অজন্তা দর্শন ব্যর্থ হতে পারে না, হয়নি। সকলকে সে আত্ম উপলব্ধির সুযোগ করে দিয়ে নিজেও সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। বসু বাণী, ‘পঞ্চম পুরুষ’ প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯, পৃষ্ঠা-২৩৬

২। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩

৩।তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৩

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৩

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৫

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৭

৬। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৯

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ২৪১

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ২৫৩

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ২৫৬

১০।তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৯

১১।তদেব, পৃষ্ঠা ২৬৯

১২।তদেব, পৃষ্ঠা ২৭০

১৩।তদেব, পৃষ্ঠা ২৭১

১৪।তদেব, পৃষ্ঠা ২৭১

১৫।তদেব, পৃষ্ঠা ২৭২

সহায়ক গ্রন্থ

১। চট্টোপাধ্যায় ডঃ প্রণবকুমার ও মুখোপাধ্যায় সুদেব, ভারত ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস, প্রান্তিক, ১৮ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা ৯।

২। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং ৫ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১০।

৩। রায় অলোক সম্পাদিত ' সাহিত্য কোষ কথাসাহিত্য' সাহিত্যলোক ৫৭ এ কারবালা ট্র্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬, ৪র্থ সংস্করণ, আগষ্ট ২০০৩।

৪। রায় সত্যেন্দ্র ' বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা ', দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭৩, ২য় সংস্করণ, আগষ্ট ২০০৯।